অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 220-224
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.031

BANGLA SAHITYA CHARCHAY DR. SHYAMAPRASAD MUKHOPADHYAY : EKTI SAMIKKHA / বাংলা সাহিত্যচর্চায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : একটি সমীক্ষা

DR. SHRABANTI PAN / ড. শ্রাবন্তী পান
সহকারী অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ, পূর্ব বর্ধমান
Email: shrabantipan.beng@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
দেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শ্যামাপ্রসাদ, বাঙালি, বাংলাভাষা, সাহিত্য, জাতি, স্বদেশপ্রীতি, সেবা, স্বাধীনতা, আন্দোলন, প্রবন্ধ, চিন্তাধারা, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্র, নাটক, রঙ্গালয়, নাট্যশালা, দেশানুরাগ, ভারতচন্দ্র

Abstract:

জন্মভূমির প্রতি দরদ নিয়ে যিনি নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, তার বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। পিতার আদর্শে সব কর্মভার কাঁধে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন রাজনীতির রণাঙ্গনে। বাঙালি জাতির সংকট মোচনে অগ্রসর হয়েছিলেন কঠিন যুদ্ধে। সাফল্য এসেছিল ঠিকই কিন্তু আত্মত্যাগের এই মহিমা সকলে অনুধাবন করতে পারেনি। বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সেদিন। সব সহ্য করেও শুধু জাতীয় সংহতির কথা চিন্তা করে আবার তিনি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে তৎপর হন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়। এই কর্মবীর মানুষটি সাহিত্যিক ছিলেন না কিন্তু সাহিত্যসাধনার জন্য কী প্রয়োজন তা তিনি খুব ভালো করে বুঝতেন। সাহিত্য যে জাতির মূল সংগঠক এটা তার বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে। এইকারণেই জাতীয় সংস্কৃতিতে সাহিত্যের গুরুত্ব নিয়ে সরব হয়েছেন বারবার। আমাদের আলোচনার বিষয় এখানে যে একজন সৎ রাজনীতিবিদ যখন দেশসেবার সঙ্গে সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন তখন সাহিত্যের পথ কতটা সুগম হয়। বাঙালি ও বাংলা ভাষার সেই সৌভাগ্য হয়েছিল।

Discussion:

২৩ শে জুন থেকে ৬ই জুলাই এই সময়কালটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে 'শ্যামাপ্রসাদ পক্ষকাল' হিসাবে বিবেচিত হয়। এর পিছনে যে রাজনৈতিক ইতিহাস অন্তর্গাথা রূপে বাঙালির হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে তার উত্তরসূরিতা নিয়েই এই আলোচনা। স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই – মৃত্যু ১৯৫৩ সালের ২৩ শে জুন) ছিলেন পিতার শিক্ষাদর্শে দীক্ষিত দেশমাতার একজন সাহসী কর্মবীর সন্তান। উজ্জ্বল মেধার দীপ্তি নিয়ে তিনি শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন শুধুমাত্র দেশসেবার ইস্পাতদৃঢ় সংকল্পে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সাহায্য করা। পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার তাগিদে যে সংগ্রামী তৎপরতা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। উচ্চকণ্ঠে নির্ভয়ে বলেছিলেন " যতদিন হিন্দু-ধ্বংসকারী লীগ- ইংরেজ ষড়যন্ত্র চলবে ও নানাদিক থেকে হিন্দুর উপর আঘাত চলতে থাকবে, একটা হিন্দুদের জন্য রাজনৈতিক দল থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই দল ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হবে না — সহায়তাই করবে, আর হিন্দুকে রক্ষা করতে কোনরকমে পশ্চাৎপদ হবে না" [১] এই চিন্তাধারাকে সামনে রেখেই ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর 'ভারতীয় জনসংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমান পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক সীমারেখাকে সুনিশ্চিত করেন (১৯৪৭ সাল ২০ শে জুন)। এই কর্মকাণ্ডের বির্তকে তৎকালীন নেহেরু সরকারকে বজ্রমুষ্টে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন 'আপনারা ভারতভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্থান ভাগ করেছি' [২]। এরপর স্বতস্ফূর্তভাবে জাতির ঐক্যের স্বার্থে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বন্দি হন এবং খুব নাটকীয়ভাবে ১৯৫৩ সালে ২৩শে জুন কাশ্মীরে তার মৃত্যু হয়। স্বরচিত ডায়রির ন্যায় তাঁর জীবনের শেষ অংশ খন্ডিত। এই অমিমাংসিত রহস্যময় অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক ছিলেন না কিন্তু বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ও সৃষ্টিশীল সমালোচক ছিলেন। বাঙালির সেবায় আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি আজীবন যে সংগ্রাম করেছিলেন, সাহিত্য ছিল তার প্রকাশমাধ্যম। তিনি বিশ্বাস করতেন " আমরা বাঙালী অশেষবিধ ভাগ্যবিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়াও যে একটিমাত্র ঐশ্বর্য লইয়া গর্ব করিতে পারি, সে আমাদের সাহিত্য"[৩] জাতির জীবনের মূল রসদ যে সাহিত্যের মধ্যে নিহিত থাকে একথা তিনি দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করেছেন। এই সাহিত্যকে সংরক্ষণের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত প্রতিবন্ধকতার সত্ত্বেও মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার চর্চা ও অনুশীলনের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রথমবার বাংলা ভাষায় সমাবর্তন বক্তৃতা দেন। সেইসময়ের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগটি ছিল ঐতিহাসিক। বাঙালি যেন বাংলা ভাষায় অজ্ঞ না হয় এ বিষয়ে ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। সর্বভারতীয় স্তরে বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে যশস্বী কবি-সাহিত্যকের রচনা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যেন অনূদিত হয় সে বিষয়েও যত্নশীল ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রেনেশাঁসের দুই প্রাণপুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। এই দুই মনীষীর সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে দেশসেবা শ্যামাপ্রসাদকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যেকারণে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছিল তার কাছ জীবনবেদের ন্যায়। এর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি স্বদেশবাসীর মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল সেই উচ্ছ্বসিত প্লাবনে তার শরীর-মন প্লাবিত হয়েছিল। এর জপমালা মন্ত্রের ন্যায় জপতেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশভূমির প্রতি প্রণতিসংগীত —

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার' পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা "[৪]

রাজনীতির রণাঙ্গনে এই সুমধুর সঙ্গীত শ্যামাপ্রসাদকে আরও দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর করে তুলেছিল। সাহিত্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি থেকেই তিনি বারংবার বাঙালিকে সমূহ পঞ্চাশের মন্বন্তর কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে নিজেকে সাহিত্যসেবায় অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ ও তার প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন "সাহিত্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে যেমন রূপায়িত করে তেমনই তাহাকে গতিও দেয়। ভাষা এবং সাহিত্যের পথ দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।"[৫]

কটকে আয়োজিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট করে জানান 'আমি নিজে সাহিত্যিক নহি, তবে জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিতে, বলশালী করিতে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা যে কী তাহা আমি বুঝি।'[৬] শ্রীচৈতন্যের আশীষধন্য বাংলা সাহিত্যের অমৃত সুধানপান করে তৃপ্ত পাঠককুলকে এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার মতে সাহিত্য সমন্বয়ের শিক্ষা দেয়। ভাষা তার অভিভাবক রূপে কাজ করে। যে দেশের ভাষা যত শক্তিশালী হবে, সে দেশের সভ্যতা- সংস্কৃতির ক্ষেত্র তত বীর্যবান ও বলশালী হবে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে নবভাবধারার অর্থাৎ দেশানুরাগের কথা উচ্চারিত হয়েছে, তাকে তিনি কুর্নিশ জানিয়েছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব চৌধুরী, রাজনারায়ণ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখের বংলা প্রবন্ধে চিন্তাশীল মতামত এবং তাতে বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে যে মূলায়ন রয়েছে সে বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের ছিল মননশীল দৃষ্টি। বাঙালির সজীবতা ও সতেজতা নিয়ে যতবার প্রশ্ন উঠেছে তিনি পথপ্রদর্শক রূপে সমকালীন মনীষীবর্গকে স্মরণ করেছেন – রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ। তার মতে জাতির দুর্দিনে মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল হল সাহিত্য। শুধু লোকরঞ্জন নয়, সাহিত্যের পাতায় জাতির যে গঠনমূলক পুনরুজ্জীবনের রসদ লুকিয়ে আছে তাকে অনুসন্ধানার্থেই সাহিত্যচর্চা অনিবার্য।

বাংলা নাটক যে গ্রাম্যযাত্রা, কবিগান, তরজা, আখরাই প্রভৃতির উত্তরাধিকার রূপে বাঙালির আমোদ-প্রমোদের আঙিনায় প্রবেশ করেছে একথা সবার জানা। ব্রিটিশ রাজত্বে পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যমঞ্চের অভিনয় দ্বারা প্রভাবিত অভিজাত বাঙালি তরুণদল। তাদের শৌখিনতা থেকেই জন্ম শখের নাট্যশালার। বৈভব ও বিলাস ছিল এর প্রধান অঙ্গ। এই বিলাসিতাই ধীরে ধীরে বাঙালি নাট্যকারদের কলম ধরতে বাধ্য করে। যেমনটি ঘটেছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রে। মঞ্চের সঙ্গে মাটির মানুষের সংযোগস্থাপনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে নাটক। বিভিন্ন

ইউরোপীয় রঙ্গালয়গুলিতে ইংরাজি নাটক দেখে উদ্বুদ্ধ বাঙালি আপনার গৃহাঙ্গনে নাটকের অভিনয় শুরু করে আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে। এর সাফল্যস্বরূপ ১৮৫৭ সালে অভিনীত হয় বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'। দর্শক উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাকে গ্রহণ করেছিল। একে একে শকুন্তলা, বেণীসংহার, বিক্রমোবর্শীয়, রত্নাবলী প্রভৃতির অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের প্রাক্‌পর্ব সমাপ্ত হয়। এরপর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অবিনাশ কর, রাজেন্দ্রলাল পাল প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় ন্যাশানাল, গ্রেট ন্যাশানাল, বেঙ্গল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ে বাঙালির লেখা বিখ্যাত সব নাটক নীলদর্পণ (১৮৭২), জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, কৃষ্ণকুমারী,শর্মিষ্ঠা প্রভৃতির অভিনয়ে বাংলার নাট্যশালাগুলিতে উৎসবের সূচনা হয়। শত বাধা-বিপত্তিতেও এই নাট্যশালাগুলির মঞ্চ সজীব ছিল, যার কারিগর পূর্বোক্ত নাট্যব্যক্তিত্ববর্গ। বাংলার রঙ্গালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই সমীক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান।[৭]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বদেশপ্রীতিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালনে অঙ্গিকারবদ্ধ ছিলেন আর সেখানে সাহিত্য ছিল তার জিয়নকাঠি। এর যাদুস্পর্শে তিনি নিজেকে বাঙালিকে উজ্জীবিত রাখার প্রয়াস করেছেন। স্রষ্টা না হয়েও যে সৃষ্টিতে অবদান রাখা যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সমালোচনাগুলি তার প্রমাণ। বিপর্যস্ত বাঙালিকে বারবার অভয়মন্ত্র দান করেছিলেন তিনি সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে। যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা কিংবা বিষবৃক্ষের তুলনায় 'আনন্দমঠ' তার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি মনে করতেন 'যে সাহিত্য মানুষ গড়ে সেই সাহিত্যই তিনি গড়িয়া গিয়াছেন।'[৮] বঙ্কিমচন্দ্র তার চোখে একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। দীনদরিদ্র দেশবাসীকে জীবনের সংরাগে অনুরণিত করার প্রয়াস করেছিলেন অপর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার সাহিত্যের পাতায় ছিল বাঙালির চোখের জলের দিনলিপি। বেদনার্ত অশ্রুপল্লবে সিক্ত হৃদয়ে বাঙালিকে নিজেদের গল্প শুনতে বাধ্য করেছিলেন। মর্মান্তিক দুঃখের যাত্রায় যে সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল তাকেই পরমস্নেহে বাঁচার রসদ করে নতুন সুরে জীবনমুখী করে তুলেছিল পরাঙ্মুখ বাঙালিকে। সাহিত্যসাধনার এই প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্রকেও স্মরণ করেছেন। তার মতে রাজসভার ঐশ্বর্যের মুকুট পরেও যে মানুষের কাছাকাছি আসা যায়, 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রবাদগুলো তার প্রমাণ। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সেই শব্দগুচ্ছ কবিকে কালজয়ী করেছে। যেমন নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, আপনি আচরে ধর্ম শেখাও অপরে ইত্যাদি। এইভাবে বাংলা সাহিত্য এবং লেখককুলের প্রতি সম্মাননাপূর্বক যে আলোচনা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে পাই তা যথেষ্ট ইতিবাচক আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে। যেখানে বাঙালি মা আত্মগর্ব স্বরে উচ্চারণ করে– 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না।'

Reference:

১. মুখোপাধ্যায় উমাপ্রসাদ (সম্পা:), (১৯৬০),শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,পৃ.৫৫
২. রায় তথাগত, (১৪২৫), ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২৩৯ (পরার্ধ)
৩. রায়চৌধুরী বিভাস, (১৩৬৩), শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা, শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন, পৃ. ৩১
৪. তদেব, পৃ. ৫০
৫. তদেব, পৃ. ৫৩
৬. তদেব, পৃ. ৫৪

৭. তদেব, পৃ. ৯১
৮. তদেব, পৃ. ১১

Bibliography:

1. *মুখোপাধ্যায় উমাপ্রসাদ (সম্পা:), শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০*
2. *রায় তথাগত, ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪২৫*
3. *রায়চৌধুরী বিভাস, শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা, শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন, কলিকাতা, ১৩৬৩*

লেখক পরিচিতি : ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ, পূর্ব বর্ধমান।
যোগাযোগ : ফোন : ৭৯০৮১৫১৬৭২, ইমেল – shrabantipan.beng@gmail.com

CC BY NC